সংবাদ

তারিখ 08 SEP 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

ডিজিটাল বিশ্বে সাক্ষরতা ও বাংলাদেশ

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

'ডিজিটাল বিশ্বে সাক্ষরতা' প্রতিপাদ্যে আজ ৮ সেপ্টেম্বর দেশে দেশে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য 'ডিজিটাল' কথাটি কয়েক বছর আগেও আমাদের দেশে শুধু রাজনৈতিক ঘোষণা ছিল। এখন মোবাইল ফোনে ব্যাংকিং, চিকিৎসাসেবা, ট্যাক্স নিবন্ধন, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক নিবন্ধন, আয়কর পরিশোধ, ঈদে অনলাইনে পণ্য কেনাবেচায় রেকর্ড, অনলাইনে প্রশিক্ষণ, রেল, বিমান, লঞ্চের টিকিট ক্রয়, উৎসবে নববর্ষে ই-কার্ড চালু, বিচার বিভাগের ডিজিটাইজেশন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির ডিজিটাল মনিটরিংয়ের সঙ্গে আমরা কম-বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। বর্তমানে ২৩ হাজার ৩৩১টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম রয়েছে।

সাক্ষরতার সংজ্ঞা, অর্থ ও প্রতিপাদ্যে পরিবর্তন

ইউনেস্কো সাক্ষরতার যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা হলো : 'ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed and written materials associated with varying contexts. Literacy involves a continuum of learning in enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and wider society' আভিধানিক অর্থে 'সাক্ষরতা' বলতে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বুঝলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এর অর্থ ও ব্যাপকতা বিস্তৃত হয়ে চলেছে। এখন সাধারণ অর্থে সাক্ষর বলতে মাতৃভাষায় পড়া, লেখা ও হিসাব করায় সক্ষম ব্যক্তিকে মনে করা হয়। বিগত অর্ধশতকের বেশি সময় ধরে সাক্ষরতার ধারণা ও উপলব্ধিতে নানা পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশে 'সাক্ষরতা' শব্দের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় ১৯০১ সালে আদমশুমারির সরকারি প্রতিবেদনে। তখন তা ছিল মাতৃভাষার নাম স্বাক্ষর করতে পারার ক্ষমতা। ১৯৫১ সালে তা হয়ে যায় স্পষ্ট ছাপার অক্ষরে লেখা যে কোন বাক্য পড়তে পারার ক্ষমতা। ১৯৬১ সালে যে বুঝে কোন ভাষা পড়তে পারতো, সেই ছিল সাক্ষর। ১৯৭৪-এ যে-কোন ভাষা পড়তে এবং লিখতে সক্ষম ব্যক্তিকে সাক্ষর হিসেবে গণ্য করা হত। ১৯৮১ সালে কোন ভাষায় চিঠি লিখতে পারার ক্ষমতা থাকলে তাকে সাক্ষর বলা হতো। ১৯৮৯ সালে তা হয় মাতৃভাষায় কথা শুনে বুঝতে পারা, মৌখিক ও লিখিতভাবে তা ব্যক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন হিসাব করার এবং লিপিবদ্ধ করে রাখার ক্ষমতা লাভ। বর্তমানে সাক্ষরতার পরিধি শুধু মাতৃভাষা চর্চা ও হিসাব-নিকাশ আয়ত্ত করার মধ্যে সীমিত নেই। কম্পিউটার সাক্ষরতা, আর্থিক সাক্ষরতা, সাংস্কৃতিক সাক্ষরতার মতো বিভিন্ন নাগরিক প্রসঙ্গ সর্বোপরি উন্নত জীবনের জন্য অপরিহার্য মানসম্মত দক্ষতা অর্জন, দেশাত্মবোধ, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ তৈরির সোপান হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। সাক্ষরতা দিবসের বিষয় নির্বাচনের মধ্যে অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণে সময়ের ব্যবধান ও প্রযুক্তির বিকাশ কীভাবে প্রভাব রেখেছে তাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ২০০৬ সালে দিবসটির নির্ধারিত প্রতিপাদ্য ছিল 'সাক্ষরতা উন্নয়নকে টেকসই করে'। ২০০৭ ও ২০০৮ ছিল 'সাক্ষরতা ও স্বাস্থ্য'। সাক্ষরতা কীভাবে এইচআইভি, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়ার মতো ব্যাধির বিস্তারে প্রতিরোধী ভূমিকা রাখতে পারে তার উপর গুরুত্ব দিয়েই ওই দুই বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়। জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্ব দিয়ে ২০০৯ ও ২০১০ তা ছিল 'সাক্ষরতা ও ক্ষমতায়ন'। সাক্ষরতা অর্জনের সঙ্গে সমাজে ও বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে মাথায় রেখে ২০১১ ও ২০১২ সালের প্রতিপাদ্য ছিল 'সাক্ষরতা ও শান্তি'। জাতীয় পরিমণ্ডল ছাড়িয়ে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে ২০১৩ সালে দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল 'একবিংশ শতাব্দীর জন্য সাক্ষরতা'। সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশগত সুরক্ষার বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে ২০১৪ সালে নির্ধারিত হয় 'সাক্ষরতা ও টেকসই উন্নয়ন'। দেশে দেশে সমাজের বিভিন্ন স্তর ও অংশে অস্থিরতা, অসাম্য ও বঞ্চনার বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে ২০১৫ সালে সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে নির্ধারিত প্রতিপাদ্য ছিল 'সাক্ষরতা ও টেকসই সমাজ'। আর ২০১৬ সালে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত ও প্রতিধ্বনিত হয় 'অতীতকে জানবো, ভবিষ্যৎকে গড়বো' এ প্রতিপাদ্যে।

মানবাধিকার ঘোষণা, সংবিধান ও গ্লোবাল রিপোর্ট

জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণায় (১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮) ২৬ নং ধারায় বলা হয়েছে : ক. প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততপক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে লভ্য থাকবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সবার জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে। **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের** ১৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে : ক. রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সব বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য; খ. সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সুদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; গ. আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সবার জন্য শিক্ষা শিরোনামে ইউনেস্কো ২০০৩ সাল থেকে প্রতি বছর শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করে আসছে। যা **'সবার জন্য শিক্ষা : গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট'** নামে পরিচিত। এর মধ্যে ২০০৬ সালে প্রকাশিত রিপোর্টের প্রায় পুরোটাই ছিল সাক্ষরতার ওপর। 'জীবনের জন্য শিক্ষা' ছিল প্রধান উপজীব্য। এতে বলা হয়, সাক্ষরতা একটি অধিকার এবং সব শিক্ষার ভিত্তি। সাক্ষরতা মানুষকে জীবনযাপনের জ্ঞান ও কৌশল শেখায়। সমাজে অধিকতর সক্রিয় অংশগ্রহণে অভ্যস্ত করে। আজকের জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতিতে সাক্ষরতায় দক্ষতা আগের যে কোন সময়ের চেয়ে গুরুত্ববহ।

বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচি

বিপুল জনগোষ্ঠীর নিরক্ষরতা দূর করে তাদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে নিয়ে ২০০৯ সালের শেষ দিকে বাংলাদেশের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প গ্রহণ করে। দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর পর ২০১৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি প্রকল্পটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের অনুমোদন পায়। এরপরই সম্পূর্ণ সরকারের অর্থায়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর তত্ত্বাবধানে প্রকল্পের বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলার ২৫০টি উপজেলার ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ৪৫ লাখ নিরক্ষরকে সাক্ষর করাসহ জীবনমুখী শিক্ষাদানের উদ্যোগ নেয়া হয়। উল্লেখ্য, তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে কর্মসূচির (পিইডিপি-৩) আওতায় ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী বিদ্যালয়বহির্ভূত ও ঝরেপড়া ২৫ লাখ শিশুকে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর সমান শিক্ষা দিতে 'দ্বিতীয় সুযোগ ও বিকল্প শিক্ষা' নামের কর্মসূচি বাস্তবায়নে শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা (দ্বিতীয় পর্যায়ে) প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচির পর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের অধীনে পিইডিপি-৩-এর মাধ্যমে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে বিদ্যালয় গমনোপযোগী শতভাগ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনার কার্যক্রমে, রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্পের (রক্ষ)-এর মাধ্যমে ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রায় সাড়ে সাত লাখ বিদ্যালয়বহির্ভূত ও ঝরেপড়া শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষাদান এবং সরকারি এসব উদ্যোগের পাশাপাশি সারাদেশে প্রায় এক হাজার বেসরকারি সংস্থার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনার প্রাসঙ্গিকতায় পিইডিপি-৪ কীভাবে অগ্রসর হবে তা নিয়ে সরকার, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি শিক্ষা এনজিওগুলো কাজ করছে। তবে যাদের সংশ্লিষ্ট না করে শিক্ষায় কোন ইতিবাচক পরিবর্তন আনা অসম্ভব, সে শিক্ষকদের তাতে অংশগ্রহণ চোখে পড়ে না বললেই চলে। শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্বের দাবিদার শিক্ষক সংগঠনগুলো এক্ষেত্রে উৎসুক বা আগ্রহী বলেও মনে হয় না। অভিভাবকদের সম্পৃক্তির বিষয়টিও কমবেশি কাগুজে দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সীমিত।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি

নিরক্ষর জনগণকে সাক্ষরতা জ্ঞান দিতে সরকার বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগিতায় ও নিজস্ব অর্থায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। উপানুষ্ঠানিক-শিক্ষা প্রকল্প- ১, ২ ও ৩ তার অন্যতম। প্রকল্পটি এনজিও-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। পরবর্তীতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৪ বিভিন্ন জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে বাস্তবায়ন করা হয়। যা টোটাল লিটারেসি মুভমেন্ট (টিএলএম) নামে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করে। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে নব্য সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরা কিছুদিনের মধ্যেই সাক্ষরতার মান ধরে রাখা এবং নতুন কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধি ও দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে তাদের মুক্ত করার লক্ষ্যে আরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) আর্থিক সহায়তায় ২৯টি জেলায় ২১০টি উপজেলায় মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ গ্রহণ করা হয়। ৫৭৫ কোটি ৩৬ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি জুলাই ২০০২ হতে ২০১৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য ছিল মানব উন্নয়নে বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা, কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর (আইএমইডি) সমীক্ষায় দেখা যায়, মাত্র ৩৩ ভাগ উপকারভোগী প্রকল্প থেকে অর্জিত প্রশিক্ষণ তাদের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তনে ফলদায়ক হয়েছে। ৬০ ভাগ উপকারভোগী বলেছেন যে, এ প্রশিক্ষণ চাহিদা মাফিক না হওয়ায় এটি তাদের জীবনমান পরিবর্তনে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হওয়ার কারণ হিসেবে শতকরা ৮০ ভাগ উপকারভোগী অর্থের অভাবকে দায়ী করেছেন। ৭৮ শতাংশ সহজ শর্তে ঋণ প্রদান না করা এবং ৬০ ভাগ সহযোগিতার অভাবকে দায়ী করেছেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের অন্যতম সমস্যা ছিল জেলাভিত্তিক ২৯টি অনভিজ্ঞ এনজিও নির্বাচন। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জন পুরোটাই এনজিওদের অঙ্গীকার, দক্ষতা ও আন্তরিকতার উপর নির্ভর ছিল। কিন্তু কিছু কিছু এনজিও তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিল না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অন্যের জমিতে মাত্র ৪-৮ হাজার টাকায় কেন্দ্রঘর স্থাপন করার ফলে কেন্দ্রগুলো মানসম্পন্ন ও টেকসই ছিল না। ফলে বিভিন্ন কারণে প্রকল্পের কার্যক্রম টেকসই করা সম্ভব হয়নি। এ প্রসঙ্গে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) বাসুদেব গাঙ্গুলী একটি জাতীয় দৈনিককে বলেছেন, এই প্রকল্পটি অনেক আগে শেষ হয়েছে। এর ধারাবাহিকতাও নেই। তবে সারাদেশে সাক্ষরতার হার বাড়াতে নতুন করে দেশব্যাপী ৬৪টি জেলায় মৌলিক সাক্ষরতা শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এজন্য ১৩৭টি উপজেলায় ১৩৭টি এনজিও নির্বাচন করা হয়েছে।

এসডিজি ৪ প্রসঙ্গ

টেকসই উন্নয়নের ১৭ লক্ষ্য ও বাংলাদেশ বিশ্বজুড়ে দারিদ্র্য, অসাম্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের সংকট মোকাবিলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বকে এগিয়ে নিতে ২০১৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ২০৩০ সালের মধ্যে নতুন লক্ষ্যমাত্রা জাতিসংঘে গৃহীত হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের মেয়াদপূর্তিতে নেয়া উচ্চাভিলাষী এই পরিকল্পনাকে বলা হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা এসডিজি। ১৫০টি দেশ থেকে আসা প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এক সম্মেলনে এসডিজি আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পায়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সম্মেলনে অংশ নেন এবং জোরালো বক্তব্য রাখেন। এসডিজির ১৭ লক্ষ্যের মধ্যে ৪ নম্বরে আছে শিক্ষা। এসডিজি ৪ নম্বর লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা এবং সবার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা সুযোগ নিশ্চিতকরণের কথা বলা হয়েছে। বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে দক্ষ ও মানসম্পন্ন শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের ওপর। বাংলাদেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, এনজিও ও সুশীলসমাজ হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিরা এসডিজি-৪ নিয়ে নানামুখী কাজ করছে। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করছে। কিন্তু বিশ্বের দেশে দেশে শিক্ষক সংগঠনগুলো এসডিজি-৪ নিয়ে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করলেও বাংলাদেশে এক্ষেত্রেও শিক্ষক সংগঠনগুলোর তৎপরতা নেই বললেই চলে। তবে অতি সম্প্রতি ইনিশিয়েটিভ ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (আইএইচডি) এর সঙ্গে তাদের কিছু যৌথ উদ্যোগের কথা জানা যাচ্ছে।

ইরিনা বোকোভা, ফোবর্স ও মোস্তফা জব্বারের বক্তব্য

এ বছরের সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে ইউনেস্কো মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা বলেছেন, বিশ্বের ৭৫০ মিলিয়ন প্রাপ্ত বয়স্ক এখনও সাক্ষরতার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের অনেক দূরে। ২৬৪ মিলিয়ন শিশু ও তরুণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তথ্য ও যোগাযোগবিষয়ক প্রযুক্তি এসব বাধা মোকাবিলায় ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। ডিজিটাল উপকরণাদি শিক্ষায় অভিগম্যতা বৃদ্ধি ও মানসম্মত শিক্ষা প্রসারে এখনই বিশাল অবদান রাখছে। নাগালের বাইরে থাকা মানুষদের কাছে নিয়ে আসা থেকে শুরু করে সাক্ষরতা অর্জন ও সাক্ষরতার মান উন্নয়নে এবং এক্ষেত্রে মনিটরিং করতে ঐতিহাসিক, ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। ফোর্বসের ওয়েবসাইটে ডিজিটাল শিক্ষা নিয়ে প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এর সঙ্গে যোগ করা যায়। যেমন, '৬০০ বছর আগে জার্মানির গুটেনবার্গ ছাপাখানা আবিষ্কার করে যে ধরনের বিপ্লব সাধন করেছিলেন শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর বিশ্বকে সেভাবেই বদলে দেবে। ডিজিটাল শিক্ষা এখন আর ডিজিটাল ক্লাসরুমে স্মার্ট বোর্ড, শিক্ষামূলক খেলা বা ক্লাসরুমের রূপান্তরই নয় বরং যেসব শিক্ষার্থী শিক্ষার সুযোগের বাইরে তাদের জন্যও এক অনন্য সুযোগ হতে পারে। বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ মোস্তফা জব্বার বিষয়টিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন। তার মতে, আমাদের খুদে শিক্ষার্থীরা এখন বইয়ের বোঝায় কাহিল। স্কুলব্যাগের ওজন কমানোর জন্য সাধারণ প্রস্তাব হচ্ছে বইয়ের সংখ্যা কমানো। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বইয়ের সংখ্যা কমানো গেলেও স্কুলব্যাগের ওজন কমানোটা ডিজিটাল যুগের সমাধান নয়। এখন দুনিয়ার সর্বত্র স্কুলব্যাগ থেকে শিশু/তরুণ শিক্ষার্থীদের উদ্ধার প্রচেষ্টা চলছে। ডেনমার্কের স্কুলে বই দিয়ে লেখাপড়া করানো হয় না। সিঙ্গাপুরের ছেলেমেয়েরা আইপ্যাড দিয়ে পড়াশোনা করে। মালয়েশিয়ার স্মার্ট স্কুলগুলোতে কাগজের বই কোন প্রয়োজনীয় অনুসঙ্গ নয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাস্তবতায় ইতোমধ্যে অর্জিত অগ্রগতি এখন পর্যন্ত কতিপয় প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে, না উত্তরোত্তর উন্নয়ন আন্তর্জাতিক মানের কাছাকাছি যেতে সহায়ক হবে- বিশেষজ্ঞরাই তা ভালো বলতে পারবেন। তবে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য নির্বাচন যে, আমাদের নীতি-নির্ধারকদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ও পরিস্থিতি মূল্যায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

[লেখক : জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য]
initiativedhaka@gmail.com